সূচি

শপথ ॥ ১১
আকাশে মেলব ডানা ॥ ১৩
দীপ্ত যুবমন ও মনন ॥ ১৪
কিছুই অসম্ভব নয় ॥ ১৫
উন্নতির গতি বাড়ান : তরুণদের আর্জি ॥ ১৭
সমস্যাকে পরাস্ত করো ও সফল হও ॥ ১৮
যুবশক্তি ॥ ৩৫
একটি সবল দেশের বৈশিষ্ট্য ॥ ৩৬
ভবিষ্যতের পাঁচ রকমের মন ॥ ৩৯
প্রতিকূলতাকে সুযোগে বদল করে নেওয়া ॥ ৪২
ভারতবর্ষের বিবর্তন : ভিশন ২০২০ ॥ ৪৪
দীপ হয়ে ওঠো ॥ ৪৬
প্রকৃত শিক্ষা মানবজীবনকে মর্যাদাসম্পন্ন করে ॥ ৫৪
শিক্ষকদের জন্য ১১-দফা শপথ ॥ ৬০
আমার প্রিয় বইগুলো ॥ ৬২

কালাম-স্মরণ

রামেশ্বরম থেকে রাইসিনা হিলস—সত্যম রায়চৌধুরী ॥ ৬৮
ড. কালামের পরিবারের দুই প্রজন্মের দুই সদস্যের সাক্ষাৎকার—অয্যানী ব্যানার্জি ॥ ৭২
নীরব বীণাখানি—রাজীব চক্রবর্তী ॥ ৭৫
শান্ত অথচ সদাসক্রিয়—ড. বিকাশ সিনহা ॥ ৭৭
ড. কালামের সঙ্গে মূল্যবান কিছু সময়—সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ॥ ৮০
অসামান্য স্মৃতিশক্তি—শিবনাথ সোম ॥ ৮৪
এক প্রতিভাধর ছাত্র : এপিজে—বারিদবরণ ঘোষ ॥ ৮৮

সূচিপত্র

পর্ব-১ ॥ ডা. কালাম : জীবনী এবং জীবন প্রবন্ধন ॥ ১৫

প্রারম্ভিক জীবন ॥ ১৭
শৈশবের দিনগুলো ॥ ১৯
বৈজ্ঞানিক জীবন ॥ ২৩
বিজ্ঞান থেকে রাজনীতি পর্যন্ত পথপরিক্রমা ॥ ২৯
মুঘল গার্ডেন এবং ডা. কালাম ॥ ৩৪
রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবার পরে ॥ ৪০
ভিশন ২০২০ ॥ ৪৩
ডা. কালামের ব্যক্তিত্ব ॥ ৪৮
কালামের বিভিন্ন রচনা এবং তাঁর হিন্দি প্রেম ॥ ৫১
বিদায় কালাম ॥ ৫৪
শেষ যাত্রা ॥ ৫৮
পুরস্কার সম্মান ॥ ৫৯
কৃতিত্ব ॥ ৬০

পর্ব-২ ॥ যে স্বপ্ন ঘুমোতে দেয় না ॥ ৬১

ডা. কালামের প্রেরণাদায়ক শব্দাবলী ॥ ৬৩
যে স্বপ্ন ঘুমোতে দেয় না ॥ ৬৪
চেষ্টা করা কখনো ছেড়ে দিও না ॥ ৬৯
প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদের সাহায্য করে ॥ ৭৩
লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকুন ॥ ৭৯
সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে এবং সেগুলোর জিততে জানতে হবে ॥ ৮৩
জীবনে আলো ॥ ৮৮
পরিশ্রমই সাফল্যের একমাত্র পথ ॥ ৯১
আপনার দৃষ্টিভঙ্গী সবার চাইতে আলাদা হওয়া উচিৎ ॥ ৯৬
পরবর্তী প্রজন্মগুলোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক ॥ ১০১
জীবন এবং সময় হলো আমাদের সবচাইতে বড়ো শিক্ষক ॥ ১০৫
সত্যিকারের সৎ এবং পরিশ্রমীরাই পায় ঈশ্বরের কাছে বিশেষ সমাদর ॥ ১১১
বিজ্ঞানের মূল কাজগুলো হবে আমাদের ভাষাতেই ॥ ১১৬

CS CamScanner

সূচি

মুখবন্ধ ॥ ৯
ঋণ স্বীকার ॥ ১১
ভূমিকা ॥ ১৩

প্রথম পর্ব–প্রারম্ভ ॥ ১৫
দ্বিতীয় পর্ব–সৃজন ॥ ৬১
তৃতীয় পর্ব–স্বস্ত্যয়ন ॥ ১৩৯
চতুর্থ পর্ব–মনন ॥ ১৯১
উপসংহার ॥ ২১৩

CamScanner

পর্ব-১

ডা. কালাম : জীবনী এবং জীবন প্রবন্ধন

মুখবন্ধ

আমি এক দশকের বেশি ড. এ পি জে আবদুল কালামের অধীনে কাজ করেছি। মনে হতে পারে, সেই কারণেই তাঁর জীবনীকার হওয়ার উপযুক্ত লোক আমি নই। আর সে রকম কোনো উদ্দেশ্যও আমার কখনই ছিল না। একদিন তাঁর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তরুণ ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বলবার কথা কিছু কী তাঁর আছে? তিনি যে কথা বললেন, শুনে আমি চমৎকৃত হলাম। পরে আমি সাহস করে একদিন তাঁকে তাঁর অতীত জীবনের স্মৃতির কথা জিজ্ঞাসা করলাম, যাতে কালেরগর্ভে বিলীন হয়ে যাবার আগেই সে-সব কথা লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারি।

অনেক দিন ধরে অনেক রাত পর্যন্ত, এবং কখনও বা ভোর রাত থেকে আমরা একসঙ্গে বসেছি, ড. কালামের দৈনিক আঠারো ঘণ্টা কাজের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে তার জন্যে সময় চুরি করতে হয়েছে। তাঁর চিন্তা ভাবনার গভীরতা ও ব্যাপ্তি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। সব সময়েই যে তাঁর সব কথা সহজেই বোঝা যায়, তা নয়, কিন্তু তাঁর চিন্তা সব সময়েই সতেজ, নবীন, সব সময়েই মনে সজীবতার সঞ্চার করে। তাঁর কাহিনিতে অনেক জটিলতা, বিচিত্র উপাদানের মিশ্রণ, অনেক সূক্ষ্মতা, অনেক উপমা, অনেক উপকাহিনি। কিন্তু ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে দেখতে পাই একটি অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত মন, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে এক ধারাবাহিক ইতিহাস।

CamScanner

মনে পড়ে, বাবার দিন শুরু হত ভোরের আলো ফুটবার আগে, ঠিক ৪টার সময় নামাজ পড়ে। নামাজের পর তিনি বাড়ি থেকে প্রায় চার মাইল দূরে আমাদের একটা নারকেলকুঞ্জ ছিল, সেখানে হেঁটে যেতেন। ফিরে আসতেন ডজন খানেক নারকেল কাঁধে ঝুলিয়ে। তারপর তিনি সকালবেলাকার খাবার খেতেন। ষাটের ঘরে বয়সের শেষ দিক পর্যন্ত এই ছিল তাঁর দৈনিক নিয়ম।

আমার নিজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে সারা জীবন আমি আমার বাবাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি। আমার বাবা যে সমস্ত গভীর সত্য আমার কাছে উদঘাটিত করেছিলেন, সে-সব আমি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি, আমি অনুভব করবার চেষ্টা করেছি এক ঐশ্বরিক শক্তি আছে যা ভ্রান্তি থেকে, দুঃখ থেকে, বেদনা থেকে, ব্যর্থতা থেকে মানুষকে তুলে তার যথার্থ স্থানে তাকে নিয়ে যেতে পারে। একবার যদি কেউ তার চিত্তবৃত্তিসমূহের, তার দেহের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে, স্বাধীনতার, সুখের শান্তির পথ তার সামনে খুলে যায়।

আমার যখন বছর ছয়েক বয়স, আমার বাবা একটি কাঠের নৌকা নির্মাণের কাজে হাত দিলেন, রামেশ্বরম থেকে ধনুস্কোডি (যার আরেক নাম সেতুক্কারাই) তীর্থযাত্রী নিয়ে যাবার এবং তাদের ফেরত আনবার জন্যে। আমেদ জালালুদ্দিনের নামে এক আত্মীয়, যিনি পরে আমার বোন জোহরাকে বিয়ে করেছিলেন, তাঁর সহায়তায়, সমুদ্রের তটে তিনি সেই নৌকা তৈরির কাজ করতেন। আমি দেখতাম কীভাবে ধীরে ধীরে একটি নৌকার আকৃতি গড়ে উঠছে। নৌকার বিভিন্ন অংশের কাঠ, কাঠের আগুনে তাতিয়ে পোক্ত করা হত। আমার বাবা নৌকার ব্যবসা ভালোই করেছিলেন যখন একদিন ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে এক সাইক্লোন এসে আমাদের নৌকা উড়িয়ে নিয়ে গেল, তার সঙ্গে গেল সেতুক্কারাইয়ের খানিকটা ভূ-ভাগ। সমুদ্রের সৌন্দর্যই দেখেছিলাম, এবার তার দুর্দমনীয় শক্তি আমার দৃষ্টিতে উন্মোচিত হলো।

যত দিন অকালে নৌকার মৃত্যু ঘটেছে, তার মধ্যে জালালুদ্দিন হয়ে উঠেছে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমাদের বয়সের তফাত সত্ত্বেও। তিনি বয়সে আমার চেয়ে বছর পনেরোর বড়, আমায় ডাকতেন আজাদ বলে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা পায়ে হেঁটে অনেক দূর বেড়াতে যেতাম। মস্ক স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে আমরা দ্বীপের বালুকাময় বেলাভূমির দিকে যখন এগোতাম জালালুদ্দিন এবং আমি কথা বলতাম, প্রধানত আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে। অবশ্য রামেশ্বরম, যেখানে দলে দলে তীর্থযাত্রী আসত, সেই রকম

আমার বাল্যকালে আরেকজনের প্রভাব প্রবল ছিল তিনি সামসুদ্দিন, সম্পর্কে ছিলেন আমার ভাই। রামেশ্বরমে তিনি একমাত্র সংবাদ পরিবেশক ছিলেন। পাম্বান থেকে সকালের ট্রেনে খবরের কাগজ রামেশ্বরম স্টেশনে পৌঁছাত। যারা পড়তে পারে, রামেশ্বরমের সেই ১০০০ অধিবাসীর কাছে খবরের কাগজ পৌঁছে দেওয়ার যে এজেন্সি তার একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন সামসুদ্দিন। সে-সব খবরের কাগজ লোকে কিনত জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের খবরাখবর রাখবার জন্যে, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী জানবার জন্যে এবং মাদ্রাজের বাজারের সেদিনের দরের ওঠা-পড়ার ওপর নজর রাখবার জন্যে। কয়েকজন পাঠক, যাদের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশি প্রসারিত ছিল, তারা হিটলার, মহাত্মা গান্ধী এবং জিন্নাহর কথা আলোচনা করত। সব আলোচনাই শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাত পেরিয়ার ই.ভি. রামস্বামীর বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিশাল রাজনৈতিক স্রোতধারায়। *দিনমণি* ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা। তাতে যা ছাপা হত সে-সব যেহেতু আমার বোধগম্য ছিল না, সামসুদ্দিন পত্রিকাগুলোকে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আগে তার ছবিগুলো দেখেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধল ১৯৩৯ সালে, তখন আমার বয়স আট বছর। কী কারণে আমি আজ পর্যন্ত জানি না, বাজারে হঠাৎ তেঁতুল-বিচির চাহিদা দেখা দিল। আমি বিচি জোগাড় করে মস্ক স্ট্রিটে একটা দোকানে বিক্রি করতাম। এক দিনের সংগ্রহ থেকে আমার আয় হত বড় কম নয়, পুরো এক আনা। জালালুদ্দিন আমাকে যুদ্ধের গল্প শোনাতেন, পরে আবার আমি দেখতাম দিনমণি খবরের কাগজের প্রধান প্রধান সংবাদে সে-সব থাকে কিনা। আমাদের অঞ্চলটা বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ, যুদ্ধে কোনো প্রভাবই তার ওপর পড়েনি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ভারতকে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিতে হলো, এবং জরুরি অবস্থার মতো একটা জারি হলো। প্রথমেই রামেশ্বরমে ট্রেন থামা বন্ধ হয়ে গেল। খবরের কাগজের বাণ্ডিলগুলো রামেশ্বরমে ও ধনুস্কোডির মধ্যে রামেশ্বরমে রোডে চলন্ত ট্রেন থেকে তখন ফেলে দিতে হত। সামসুদ্দিনকে একজনের খোঁজ করতে হলো সেই বাণ্ডিলগুলো ধরে নেওয়ার জন্যে। যেন খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই পদটি পূর্ণ করলাম আমি। সামসুদ্দিনের কল্যাণে আমি জীবনে প্রথম বেতন পেলাম। অর্ধ শতাব্দী পরে এখনও আমি অনুভব করি, গর্বে আমার বুক কেমন ফুলে উঠেছিল প্রথম নিজে টাকা রোজগার করে।

প্রত্যেকটি শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক এবং মানসিক পরিবেশের জন্মায়, এবং যেমন

CamScanner

১

আমার জন্ম মাদ্রাজ রাজ্যে দ্বীপশহর রামেশ্বরমের এক মধ্যবিত্ত তামিল পরিবারে। আমার পিতা জইনুল আবেদিনের না ছিল বিশেষ প্রথাগত শিক্ষা, না বিশেষ ধনসম্পদও। কিন্তু এ-সবের অভাব থাকলেও তাঁর ছিল সহজাত প্রজ্ঞা এবং হৃদয়ের প্রকৃত মহানুভবতা। আমার মা আশিয়াম্মার মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন এক আদর্শ সহায়িকা। ঠিক কতজনকে আমার মা প্রত্যহ অন্ন যোগাতেন আমার মনে নেই, তবে আমরা পরিবারের সকলে মিলে যত জন ছিলাম, বাইরের লোক যারা আমাদের সঙ্গে আহার করত তাদের সংখ্যা যে তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই।

বহু লোকের চোখে আমার বাবা-মা ছিলেন এক আদর্শ দম্পতি। আমার মায়ের বংশমর্যাদা অপেক্ষাকৃত বেশি মনে করা হত। তাঁর এক পূর্বপুরুষকে ব্রিটিশরা 'বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

আমি ছিলাম অনেক সন্তানের এক জন, মাথা ছোট, সাধারণ চেহারা। আমার বাবা-মা ছিলেন দীর্ঘকায়, সুদর্শন। আমরা থাকতাম পৈতৃক বাড়িতে, ১৯ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। বেশ বড়-সড় পাকা বাড়িটি ছিল ইট ও চুনাপাথরে গাঁথা, রামেশ্বরমের মস্ক স্ট্রিটে (Mosque Street)। আমার বাবা কঠোর সংযম পালন করতেন, সমস্ত রকম বিলাসব্যসন পরিহার করতেন। তবে খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, ইত্যাদি যা প্রয়োজন সে-সবেরই ব্যবস্থা ছিল। আসলে আমার শৈশবে নিরাপত্তা বোধের কোনো অভাব ছিল না, বাহ্যিক উপকরণে কিংবা মানসিক দিক থেকে।

সাধারণত আমি মায়ের সঙ্গে খেতাম, রান্নাঘরের মেঝেতে বসে আমার সামনে মা একটি কলাপাতা বিছিয়ে দিতে তাতে ভাত এবং সুগন্ধী সম্বর ঢেলে দিতেন, আর দিতেন ঘরে তৈরি এক ধরনের ঝাল আচার এবং খানিকটা নারকেলের চাটনি।

CamScanner

প্রারম্ভিক জীবন

চিন্তা করলে অবাক হতে হয় যে, একজন সাধারণ শিশু থেকে কালাম হয়ে ওঠার পথটা কিন্তু সহজ ছিল না, কিন্তু ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আব্দুল কালাম যাঁর পুরো নাম ডাক্তার আবদুল পাকির জৈনুলাব্দীন আব্দুল কালাম, তাঁর জীবনের মূল মন্ত্রই ছিল, 'কখনো ছোটো স্বপ্ন দেখো না। যে দায়িত্বই পাবে সেটিকেই একটি নতুন সংজ্ঞা দেবে।' তিনি নিজেও এমনটাই করেছিলেন, এই কারণেই তিনি জনগণের রাষ্ট্রপতি হওয়া সত্ত্বেও সকলের কাছে একজন বিশিষ্ট মানুষই থাকবেন।

তিনি প্রথম এমন একজন অরাজনৈতিক রাষ্ট্রপতি, যাঁর রাজনীতিতে আগমন হয় বিজ্ঞান এবং কারিগরি ক্ষেত্রে তাঁর উৎকৃষ্ট অবদানের জন্য। ডা. কালাম শিশু এবং যুবকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ভারতবাসী আদর করে তাঁকে 'মিসাইল ম্যান' বলে আখ্যা দিয়েছিল। নিজের সহকারীদের প্রতি ঘনিষ্ঠতা এবং ভালোবাসার জন্যে কিছু মানুষ তাঁকে 'ওয়েন্ডার অফ পিউপিল' বলত। তাঁর পরিবারের লোকেরা এবং ছোটোবেলার বন্ধুরা তাঁকে 'আজাদ' বলে ডাকতেন।

১৫ অক্টোবর, ১৯৩১-এ ধনুষকোডি গ্রামে (রামেশ্বরম, তামিলনাড়ু)-তে একটি মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে কালামের জন্ম হয়। তাঁর বাবা জৈনুলাব্দীন খুব বেশি লেখাপড়া জানতেন না, সংসারের আর্থিক অবস্থাও খুব ভালো ছিল তা নয়। কালামের বাবা জেলেদের নৌকা ভাড়ায় দিতেন। আবদুল কালাম একটি একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে থাকতেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত হতে পারে তা আন্দাজ করতে গেলে জেনে নিন যে স্বয়ং কালামেরই আরও চার ভাই এবং পাঁচ বোন ছিল এবং তাঁরা ছাড়াও ঐ বাড়িতে আরও তিনটি পরিবার বাস করত। আবদুল কালামের জীবনে তাঁর বাবার প্রভাব খুব বেশি ছিল। জৈনুলাব্দীন খুব বেশি লেখাপড়া না জানতেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠা এবং তাঁর দেওয়া সংস্কার আবদুল কালামের অনেক কাজে এসেছিল।

তিনি নিজেদের পারিবারিক বাড়িতে থাকতেন, যা উনবিংশ শতকে তৈরি হয়েছিল। রামেশ্বরমের বিখ্যাত শিব মন্দির তাঁর বাড়ি থেকে মাত্র ১০ মিনিট দূরে। ওই অঞ্চলে মুসলমানেদের বেশি সংখ্যা বেশি ছিল। তারা প্রতিদিন বিকেলে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যেত, কিন্তু একই সঙ্গে তারা রামেশ্বরম মন্দিরে মাথা ঠুকতেও ভুলত না কখনো। মন্দিরের পূজারী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী কালামের বাবার খুব ভালো বন্ধু

বিজ্ঞান থেকে রাজনীতি পর্যন্ত পথপরিক্রমা

ডা. কালামকে ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থিত এন.ডি.এ. জোটবদ্ধ দলটি রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে তাদের প্রার্থীরূপে মনোনীত করে, যাঁকে বামদলগুলো ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দলগুলো সমর্থন জানায়।

১৮ জুলাই, ২০০২ সালে ডা. কালাম ৯০ শতাংশ ভোট পেয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি হন। তাঁর আগে মোট ১০ জন রাষ্ট্রপতি হতে পেরেছিলেন। কালাম কোনো রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, যখন তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর পা রাখলেন, তখন রাইসিনা হিলের বুকের ছাতি চওড়া হয়ে উঠেছিল। মিসাইল নির্মাণকারী একজন বৈজ্ঞানিক এবার মুঘল গার্ডেনে বসে বিজ্ঞান এবং সঙ্গীত থেকে শুরু করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমব্রহ্মের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিককে যখন রাজনীতির সমুদ্রের মন্থন করতে হল, তখনও তিনি সত্য ও ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করলেন না।

২০০২ সালে কালামের নাম প্রস্তাব করা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, তখনও গুজরাটের ভীষণ দাঙ্গার আগুন পুরোপুরি নিভে যায়নি। এরকম অবস্থায় কালামকে প্রার্থী করাটাকে কিছু কিছু লোকেরা মুসলমানদের জন্যে আঘাতের ওপরে মলম, এবং কিছু লোকেরা বিজেপির রাজনৈতিক চাল হিসেবে বর্ণনা করেছিল।

সঙ্ঘের লোকেরা এই কারণে খুশি ছিল যে কালাম গীতা পড়েন। কংগ্রেস এবং সমাজপাদী পার্টিরা একজন মুসলমানের বিরোধিতা করতে পারছিল না। এমন এক আদর্শ মুসলমান, যিনি দেশকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন এবং যাঁর দেশভক্তি নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করাও সম্ভব ছিল না।

আসলে এটা ছিল রাজনীতির শুভ সংযোগ এবং সৌভাগ্য যে কালামের নাম এই পদের জন্যে আলোচিত হতে শুরু করেছিল। অনেক প্রার্থীর নামই এই পদের জন্যে আলোচিত হয়ে ছিল, কিন্তু ঐক্যমত্য হওয়া যায়নি। কখনো বিজেপি, কখনো বাজপেয়ী স্বয়ং, তো কখনো বিরোধীরা বেঁকে বসছিলেন। কিন্তু যখন কালামের নাম রাষ্ট্রপতি পদের জন্যে প্রস্তাবিত হল তখনও বামপন্থীরা রাজী হলেন না, বরং তাঁরা ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গলের মতো ব্যক্তিত্বের নাম তুলে আনলেন। সমস্ত বিরোধীরা লক্ষ্মী সায়গলের পক্ষে মতদান না করায় ডা. কালাম এক বিরাট ব্যবধানের জয়লাভ করলেন। এরপর যখন শপথ গ্রহণের সময় এগিয়ে এল তখন প্রমোদ মহাজন তাঁর

CS CamScanner

তিনি আজীবন ভাবনাত্মক বিষয়গুলোর সঙ্গেও জুড়েছিলেন। 'ইয়েনুদয়া প্রায়না' তামিল ভাষায় লেখা তাঁর কবিতা-সংগ্রহ, যার অনুবাদ ইংরেজি ভাষাতেও হয়েছে। এই বইটি তাঁর ব্যক্তিত্বের উপরে আলোকপাত করতে পারে। তিনি সঙ্গীত ভালোবাসতেন এবং নিজেরও বীণা বাজানোর শখ ছিল। তাঁর ঘরে বিজ্ঞানের বইয়ের সাথেই কবিতার বইয়ের সংগহর এবং সঙ্গীতের বড়ো ভাণ্ডার ছিল। একদিকে যেখানে বিক্রম সারাভাই তাঁর প্রেরক ও পছন্দের বিজ্ঞানী ছিলেন তেমনই মিলটন ভল্ট হোয়াইটম্যান এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর পছন্দের কবি ছিলেন। লোকে তাঁকে কি বলবে-বিজ্ঞানী, তামিল, ভালো মানুষ না ভারতীয়? স্বয়ং কালামের নিজের ভাষায়- 'একজন ভালো মানুষের বাকি তিনটে বিষয়ই পাওয়া যেতে পারে।' অর্থাৎ, কালাম চাইতেন যে লোকে তাঁকে শুধুই 'ভালো মানুষ' বলুক। আসলে, তিনি সমস্ত ধর্মের উর্দ্ধে ছিলেন। তিনি শুধু দেশেরই রাষ্ট্রপতি ছিলেন না, বরং জনতারও রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি দেশের প্রথম এমন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, যিনি জাতপাত থেকে বহুদূরে দূরে ছিলেন। তাঁর কাছে মানবতার ধর্মই সবচাইতে বড়ো ছিল।

তিনি ভারতকে যেভাবেই হোক না কেন ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বশক্তি রূপে দেখার স্বপ্ন মনের মধ্যে লালন-পালন করতেন। তিনি বিকাশের রাজনীতির পক্ষে ছিলেন। যখনই তিনি সুযোগ পেতেন, তখনই নতুন নতুন ভাবনা উপহার দিতে পিছু হটতেন না। যখন মধ্যপ্রদেশে 'অটল জ্যোতি অভিযান' শুরু হয়, যার মাধ্যমে সারা রাজ্যে চব্বিশ ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগানের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে রাজ্যের ৬টি জেলাতে এই যোজনাটি চালু হয়ে গিয়েছিল। তখন একটি জেলাতে উদ্বোধন করার জন্যে কালামকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যে বিদ্যুৎলাভের জন্যে খুশি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি জনতার মধ্যে শক্তিদক্ষতাকে গ্রহণ করার ওপরে জোর দেন। একটি নতুন বিচারধারা উপহার দিয়ে তিনি বলেন যে এর ফলে যে সঞ্চয় হবে, তা পাঁচ ধরনের ইন্ধনের ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ডা. কালাম প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা আয়ুর্বেদকে নিয়ে দারুণ উৎসাহী ছিলেন এবং সারা পৃথিবীতেই এর আধুনিকিকরণ করতে চেয়েছিলেন, একথাটি আন্তর্জাতিক এনজিও-এর প্রধানের কাছ থেকে জানা গিয়েছে। ভারত, ব্রিটেন এবং সুইজারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক আয়ুর্বেদ ফাউন্ডেশন (আই.এ.এফ)-এর প্রধান, প্রফুল্ল প্যাটেল, যখন নভেম্বর ২০০৫-এ ডা. কালামের সঙ্গে মিলিত হন, তখন তিনি আয়ুর্বেদের জন্যে তাঁর ভালোবাসার ব্যাপারে জানতে পারেন।

প্যাটেন জানিয়েছেন-'আমরা অনেক চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে ডা. কালামের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তাঁকে জানিয়েছিলাম যে ভারত এবং বিদেশে আয়ুর্বেদ নিয়ে আমাদের কি কি বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং সে ব্যাপারে তাঁর পরামর্শও চাই। তিনি হার্বাল এবং নন-হার্বাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ এবং বিকাশ কেন্দ্রগুলোর

CamScanner

তিনি আজীবন ভাবনাত্মক বিষয়গুলোর সঙ্গেও জুড়েছিলেন। 'ইয়েনুদয়া প্রায়না' তামিল ভাষায় লেখা তাঁর কবিতা-সংগ্রহ, যার অনুবাদ ইংরেজি ভাষাতেও হয়েছে। এই বইটি তাঁর ব্যক্তিত্বের উপরে আলোকপাত করতে পারে। তিনি সঙ্গীত ভালোবাসতেন এবং নিজেরও বীণা বাজানোর শখ ছিল। তাঁর ঘরে বিজ্ঞানের বইয়ের সাথেই কবিতার বইয়ের সংগহর এবং সঙ্গীতের বড়ো ভাণ্ডার ছিল। একদিকে যেখানে বিক্রম সারাভাই তাঁর প্রেরক ও পছন্দের বিজ্ঞানী ছিলেন তেমনই মিলটন ভল্ট হোয়াইটম্যান এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর পছন্দের কবি ছিলেন। লোকে তাঁকে কি বলবে-বিজ্ঞানী, তামিল, ভালো মানুষ না ভারতীয়? স্বয়ং কালামের নিজের ভাষায়- 'একজন ভালো মানুষের বাকি তিনটে বিষয়ই পাওয়া যেতে পারে।' অর্থাৎ, কালাম চাইতেন যে লোকে তাঁকে শুধুই 'ভালো মানুষ' বলুক। আসলে, তিনি সমস্ত ধর্মের উর্দ্ধে ছিলেন। তিনি শুধু দেশেরই রাষ্ট্রপতি ছিলেন না, বরং জনতারও রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি দেশের প্রথম এমন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, যিনি জাতপাত থেকে বহুদূরে দূরে ছিলেন। তাঁর কাছে মানবতার ধর্মই সবচাইতে বড়ো ছিল।

তিনি ভারতকে যেভাবেই হোক না কেন ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বশক্তি রূপে দেখার স্বপ্ন মনের মধ্যে লালন-পালন করতেন। তিনি বিকাশের রাজনীতির পক্ষে ছিলেন। যখনই তিনি সুযোগ পেতেন, তখনই নতুন নতুন ভাবনা উপহার দিতে পিছু হটতেন না। যখন মধ্যপ্রদেশে 'অটল জ্যোতি অভিযান' শুরু হয়, যার মাধ্যমে সারা রাজ্যে চব্বিশ ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগানের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে রাজ্যের ৬টি জেলাতে এই যোজনাটি চালু হয়ে গিয়েছিল। তখন একটি জেলাতে উদ্বোধন করার জন্যে কালামকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যে বিদ্যুৎলাভের জন্যে খুশি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি জনতার মধ্যে শক্তিদক্ষতাকে গ্রহণ করার ওপরে জোর দেন। একটি নতুন বিচারধারা উপহার দিয়ে তিনি বলেন যে এর ফলে যে সঞ্চয় হবে, তা পাঁচ ধরনের ইন্ধনের ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ডা. কালাম প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা আয়ুর্বেদকে নিয়ে দারুণ উৎসাহী ছিলেন এবং সারা পৃথিবীতেই এর আধুনিকিকরণ করতে চেয়েছিলেন, একথাটি আন্তর্জাতিক এনজিও-এর প্রধানের কাছ থেকে জানা গিয়েছে। ভারত, ব্রিটেন এবং সুইজারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক আয়ুর্বেদ ফাউন্ডেশন (আই.এ.এফ)-এর প্রধান, প্রফুল্ল প্যাটেল, যখন নভেম্বর ২০০৫-এ ডা. কালামের সঙ্গে মিলিত হন, তখন তিনি আয়ুর্বেদের জন্যে তাঁর ভালোবাসার ব্যাপারে জানতে পারেন।

প্যাটেন জানিয়েছেন-'আমরা অনেক চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে ডা. কালামের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তাঁকে জানিয়েছিলাম যে ভারত এবং বিদেশে আয়ুর্বেদ নিয়ে আমাদের কি কি বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং সে ব্যাপারে তাঁর পরামর্শও চাই। তিনি হার্বাল এবং নন-হার্বাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ এবং বিকাশ কেন্দ্রগুলোর

কিছুই অসম্ভব নয়

৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭

আকাশে মানুষের উড়ান মানবমনের সৃজনশীলতা ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং বহু প্রতিকূল পথ অতিক্রম করেই সম্ভব হয়েছে এই সাফল্যপ্রাপ্তি। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি লর্ড কেলভিন বলেছিলেন,

> "বাতাসের চেয়ে ভারি এমন জিনিস উড়তে পারে না এবং তাকে ওড়ানোও যায় না।"

এ ঘোষণার এক দশকের ভিতরেই রাইট ভাইয়েরা প্রমাণ করলেন, মানুষ নিশ্চিতভাবেই উড়তে পারে, তবে তার সঙ্গে যুক্ত থাকে মারাত্মক দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও ব্যয়বহুলতা।

১৯৬৯-এ সফলভাবে চান্দ্র অভিযান শেষ হবার পর, বিখ্যাত রকেট পরিকল্পক ভন ব্রন (Von Braun), যিনি মহাকাশযাত্রীসহ মহাকাশযানকে চাঁদে পাঠাতে এবং চাঁদে মানুষের পদক্ষেপকে বাস্তবায়িত করতে স্যাটার্ন-৫ রকেট বানিয়েছিলেন, তিনি ১৯৭৫-এ বলেন,

> "আমাকে যদি অনুমতি দেওয়া হয় তবে আমি 'অসম্ভব' শব্দটিকে একেবারে বাদ দিয়ে দেব।"

অতীতে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিদ্যা (dznamics) নির্ধারণ করার জন্য টলেমিয় জ্যোতির্বিদ্যার পদ্ধতি বিপুলভাবে ব্যবহার করা হতো। তখনকার ধারণা ছিল, পৃথিবী অনুভূমিক বা চ্যাপটা সমতল। পৃথিবী যে গোলাকার এবং এটা যে সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক কত সংগ্রামই না করতে হয়েছে! জ্যোতির্বিদ্যার পুরোনো ধারণা বদলাতে তিন মহান জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও ও কেপলার দিয়েছিলেন নতুন মাত্রা। এখন আমরা এটা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছি যে, পৃথিবী গোলাকার, এটি সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে, এবং সূর্য ছায়াপথে আবর্তিত হয়। আমরা প্রযুক্তিগত যেসব সুযোগ-সুবিধা আজ পাচ্ছি তা সম্ভব হয়েছে বিগত শতাব্দীগুলোতে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের

CamScanner

ভবিষ্যতের পাঁচ রকমের মন

২৫ জুন ২০০৮

বইয়ের দোকানে চোখে পড়ল হাওয়ার্ড গার্ডনারের লেখা ফাইভ মাইন্ড ফর দ্য ফিউচার বইটির ওপর। আমাদের স্মরণে রাখা দরকার বইটি প্রকাশিত হয়েছে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ২৫০০ শতাব্দী পরে। আমার ইচ্ছা ও কৌতূহল হলো বইটির বিষয়বস্তু বিশদে জানার, বিশেষ করে সামাজিক সংঘাত, রাজনৈতিক হিংসা ও বিশ্বায়নের অভিঘাত এবং বিশ্বের তরুণদের প্রশ্ন যে তাদের জীবন কোনদিকে এগিয়ে চলেছে–এই প্রেক্ষিত থেকে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বিচার করতে। আমাদের দেশের বহু ধর্মের ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট থেকে আমি আত্মপ্রত্যয়ী যে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই প্রয়োজনে দেখা দেবে তরুণদের মনের এইসব বৌদ্ধিক বিকাশের। ভবিষ্যৎ মনের পাঁচটি প্রকৃতি নিয়ে আমি বিচার-বিবেচনা করেছি; আমার উপলব্ধি অনুসারে সেগুলো আমি বর্ণনা করছি :

১. ডিসিপ্লিনারি মাইন্ড (নিয়মানুবর্তী মন) : নিয়মানুবর্তী মন দাবি করে চিন্তার প্রধান যেসব বিষয়, যার অন্তর্গত বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস এবং ধর্ম তার ওপর দক্ষতা। এগুলো বাদে নিয়মানুবর্তী মনকে অবশ্যই অন্তত একটি পেশাদারি ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার উৎকর্ষমণ্ডিত হতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, কোনো একটি বিষয়ে উৎকর্ষে পৌছাতে দশ বছর মতো সময় লাগে। এই ধরনের মন জানে কীভাবে নিবিষ্টভাবে অতিরিক্ত সময় কাজ করে দক্ষতা ও বিচারবুদ্ধির উন্নতি ঘটানো যায়।

২. সিন্থেসাইসিং মাইন্ড (সমন্বয়ী মন) : এক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হলো বিভিন্ন বিষয় ও ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে তাকে সম্পূর্ণভাবে একীভূত করে সেই সমন্বয়ী জ্ঞানকে জ্ঞাপন করা। বর্তমানকালে নিত্য বর্ধমান তথ্য, পরিসংখ্যান ও সংবাদের সমন্বয় ও তার সূক্ষ্ম প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. ক্রিয়েটিভ মাইন্ড (সৃজনশীল মন) : নতুন নতুন সমস্যা, প্রশ্ন, ঘটনার সম্মুখীন হয়ে সেগুলোর সমাধান নির্ণয় করার ক্ষমতা এখন বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাধারণভাবে